41

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 22 SEP 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষকদের পদোন্নতি ঃ প্রসঙ্গ কথা

এ, এন রাশেদা

২২শে আগস্ট, ১৯৯০। দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত একটি খবর। "১৯টি কলেজের ৬০০ শিক্ষক বেতন বৈষম্যের শিকার। এ সকল শিক্ষক জাতীয় বেতন স্কেলের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন" ইত্যাদি। মাত্র কয়েকদিন পূর্বের আরও একটি খবর "রাজধানীর বাইরের সরকারী কলেজগুলোতে ২,৬৮৪টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। নবগৃহীত সরকারী কলেজগুলোতে ৩৪০০টি পদ সৃষ্টি করা হয়নি এবং বিভিন্ন কলেজে ১৩৩৫ জন শিক্ষক ১৫-১৮ বছর ধরে প্রভাষক পদেই চাকরি করছেন।"

আবার কিছুদিন পূর্বে ২২শে মার্চ '৯০ 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি' তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের দাবীতে শিক্ষা ভবন পর্যন্ত মিছিল-সমাবেশ করলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী '৯০ একদিনের অনশনও করেছিলেন। সর্বশেষে তারা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন; শিক্ষকদের পদ শূন্য পড়ে আছে কিন্তু পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না, যোগ্যতার সকল মাপকাঠি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কি নিদারুণ অবহেলা।

গত ৯ই আগস্ট বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান-হেনা দাস) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ শতকরা ১০০ ভাগ বেতন ভাতার দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ, বাড়ীভাড়া ভাতা ও মহার্ঘ ভাতাসহ সকল প্রকার ভাতা সরকারী স্কুলের অনুরূপ দান, অবিলম্বে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা বাবদ পূর্ণ ভর্তুকি প্রদান, বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি ও পেনশনের ব্যবস্থা চালু করাসহ আরও অন্যান্য দাবীতে 'দাবী দিবস' পালন করল।

একথা কে না জানে শিক্ষাই হচ্ছে দেশ ও জাতির অগ্রগতির একমাত্র বাহন। শিক্ষা গ্রহণের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার যা সাংবিধানিক অধিকার এবং জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার। মানুষের এই মৌলিক অধিকার প্রদানে সরকার কতটুকু দায়িত্ব পালন করছে সেদিকে আমরা একটু দৃষ্টি দিতে পারি। স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত দায়িত্ব নেয়ার অঙ্গীকার করেছিল। আজ '৯০ সালে তার অবস্থা একটু দেখার চেষ্টা করা যাক। সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলের সংখ্যা মোট ৭,৮৯০টি। তার মধ্যে সরকারী স্কুল মাত্র ২৬২টি এবং বেসরকারী ৭,৬২৮টি। সরকারীতে শিক্ষকসংখ্যা ৫,৫০৫ জন এবং বেসরকারীতে ৯৭,৩২৯ জন। নিম্ন মাধ্যমিক অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ২,২৬৭টি এবং সরকারী সংখ্যা শূন্য। শিক্ষকসংখ্যা ১৪,০০১ জন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২,৬৪,০২৩ জন এবং ছাত্রী ৯৭,৪৬৭ জন। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ১,৬৪,৪৩৭ জন, তন্মধ্যে ছাত্রী ৭৩,২২৩ জন। পক্ষান্তরে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ২৩,৭৭,৮৭৯ জন এবং ছাত্রী ৭,৫৭,৪৫০ জন ('৮৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত হিসেব)

এ হিসেব থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব কতটুকু বহন করছে? যারা দেশ ও জাতির এই কঠিন দায়িত্ব নিজেদের উদ্যোগে পালন করছেন তাদের সম্মানজনকভাবে জীবনযাপনের নিশ্চয়তা এবং চাকরিশেষে জীবনের একটুখানি নিশ্চয়তার আশ্বাস কে দেবে? তার ওপর সরকার এ বছর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীবেতন মওকুফের ঘোষণা দিয়েছে অথচ এর দায়িত্ব সরকার কতটুকু নিজ কাঁধে গ্রহণ করেছে? সরকার পরিচালিত স্কুল কয়টি? তাহলে বেসরকারী ঐসব স্কুল কিভাবে চলবে? এ প্রশ্নগুলো স্বভাবতঃই চলে আসে।

এবার কলেজ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বর্তমানে সরকারী কলেজে শিক্ষকদের মাঝে স্বার্থের সংঘাত সরকারই সৃষ্টি করে রেখেছে। অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের পর সব আমলেই সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন কলেজ সরকারীকরণের ঘোষণা দিয়েছে। আর তার খেসারত দিচ্ছেন সকল পর্যায়ের শিক্ষকরা।

আর একদিকে যেসব বেসরকারী কলেজ আছে সেখানে অধিকাংশ শিক্ষকেরই কোন পদোন্নতি নেই। বর্তমানের প্রচলিত নিয়মে কাউকে হয়ত সারাজীবন প্রভাষক পদেই থাকতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে ৬ জন শিক্ষক হলে ৮ বছর পর ৩জন সহকারী অধ্যাপকের পদে উত্তীর্ণ হবেন বলে একবার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং এই অনুপাতের বাইরে যারা তারা টাইম স্কেল পাবেন। কিন্তু সে টাইম স্কেলও এখন আর দেয়া হচ্ছে না। একজন বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সারাজীবন তার প্রারম্ভিক স্কেলেই রয়ে যাবেন। সরকার থেকে প্রদত্ত ৭০ শতাংশ বেতন, ঐ প্রারম্ভিক বেতনের হারেই দেয়া হতে থাকবে বছরের পর বছর। এর কোন সদুত্তর আছে কি? অথচ স্নাতক পর্যায়ের এই কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। তাদের পদোন্নতির বিষয়গুলো গণতান্ত্রিক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত কোন কমিটি দ্বারা হওয়া উচিত ছিল এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের ওপরই ন্যস্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৩-এর অধ্যাদেশের ৩১,৩২ ও ৩৩ ধারা অনুযায়ী বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতির কাঠামোসহ চাকরিবিধি প্রণীত হয়েছে এবং যা অর্ডিন্যান্সের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে কলেজে যোগ্যতার ভিত্তিতে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক পদের বিধান আছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের কোন ব্যবস্থা আজও নেয়া হয়নি। কিন্তু এই অর্ডিন্যান্সকে অবজ্ঞা করে সরকারী ঐ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। যা ন্যায়সঙ্গত তা করা হয় না। কিন্তু যা অসংগত তা করা হয়।

বলা হয় মেধাবী ব্যক্তিরা শিক্ষ

করে আসবে? যারা এ সমাজে প্রতিটি স্তরের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবে, তাদের পদোন্নতি বা ন্যূনতম আনুষঙ্গিক সুবিধাদি না দিয়ে অন্যান্য পেশার চাইতে তুচ্ছ জ্ঞান করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি তো আশা করা যায় না।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি বিধানের লক্ষ্যেই শিক্ষকতা পেশাকে সম্মানজনক অবস্থায় উপনীত করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষক আন্দোলনের দিকেও দৃষ্টি দিতে পারি। ১৯৮৭ সালের ৪ঠা আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতব্যাপী ২,৩৫,০০০ জন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক ৩২ দিন ধর্মঘটের ফলে তাদের পদোন্নতি ও চাকরির শর্তাবলী পরিবর্তন ও বেতন পুনরীক্ষণের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। 'পদের অভাব পদোন্নতির অন্তরায় হবে না' — এই দাবীও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের পদগুলো এইরূপ—প্রভাষক পদ থেকে ৬/৮ বছর পর যোগ্যতার ভিত্তিতে সিনিয়র প্রভাষক এবং তার আরও ৮ বছর পর প্রকাশনা থাকলে রীডার, নতুবা সিলেক্সান গ্রেড লেকচারার অথবা ১০ বছর পর রীডার এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে প্রফেসর। এক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রমাণিত হলে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার পদোন্নতি অন্তরায় হয় না। আন্দোলনের ফলে তাদের অর্জিত জাতীয় বেতন স্কেলের কথাও স্মরণ করা যাক। আন্দোলনের পূর্বে একজন লেকচারার-এর স্কেল ছিল ৭০০-১৬০০ রুপী, পরে তা হয়েছে ২২০০-৭৫-২৮০০-১০০-৪০০০ রুপী। পরবর্তী ৬/৮ বছর পর সিনিয়র লেকচারার স্কেল ৩০০০-১০০-৩৫০০-১২৫-৫০০০ রুপী, ৮/১০ বছর পর পরবর্তী পদোন্নতি রীডার, পূর্বে ছিল ১২০০-১৯০০ পরবর্তীতে ৩৭০০-১২৫-৪৭০০-১৫০-৫৭০০ রুপী এবং প্রফেসর পদে পূর্বে ছিল ১৫০০-২৫০০ পরবর্তীতে ৪৫০০-১৫০-৫৭০০-২০০-৭৩০০ রুপী। এছাড়াও আছে মহার্ঘ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং মূল বেতনের ১৫% বাসাভাড়া ও অন্যান্য কতিপয় সুযোগ-সুবিধা।

সরকারী ও বেসরকারী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় নির্বিশেষে শিক্ষকদের এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা অর্জন সম্ভব হয়েছে তাদের আন্দোলনের ফলে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের মাঝে সহমর্মিতা ও সমঝোতার ফলে। কিন্তু আমাদের এখানে দীর্ঘদিন ধরে সুকৌশলে সরকার যে বিভেদের বীজ বপন করে রেখেছে তা যোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। তাই আজ কোটারী স্বার্থে শিক্ষক আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। অনেকেই চায় শুধু নিজের পদোন্নতি। অন্য পক্ষের পথ রুদ্ধ হলে খুশী হওয়ার মানসিকতাও দেখা যায়। কাজেই সার্বিক শিক্ষক সমাজের পদোন্নতি বা মর্যাদা বৃদ্ধির পথ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু এমন অবস্থা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কারও কাম্য হতে পারে না। কাজেই আজকের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক সমাজ তথা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার স্বার্থে শিক্ষকদের পদোন্নতির তথা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি জরুরীভাবে বিবেচনা করা দরকার।